কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
ব্রিফিং নোট
২২

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষন এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে, এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

অতিমারির ফলে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে প্রায় দেড় বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি বিবেচনা করে গত সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত আকারে স্কুল খোলা হয়েছে। কিন্তু স্কুল খোলার পর দেখা যাচ্ছে 'ঝরে পড়া' শিশুর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক গবেষণা ও জরিপ অনুযায়ী এই সমস্যার মূল কারণ বাল্যবিবাহ এবং শিশুশ্রম। করোনাকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশু মূলত দারিদ্র্য ও অন্যান্য সামাজিক কারণে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের শিকার হয়েছে যা প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

এই প্রেক্ষিতে ২৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)-এর পক্ষ থেকে "অতিমারি-উত্তর শিশুদের স্কুলে ফেরা" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করা হয়।

সংলাপ সঞ্চালনা করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। তিনি জানান, দেড় বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর গত সেপ্টেম্বরে যখন সীমিত আকারে খোলা হয়েছে তখন দেখা গেলো শিক্ষার্থীদের একটি অংশ বাল্যবিবাহ ও শিশু শ্রমের কারণে ঝরে পড়েছে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষত নারী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের কি করণীয় সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও এমজেএফ এ আলোচনাটির উদ্যোগ নিয়েছে।

অতিমারি-উত্তর শিশুদের স্কুলে ফেরা

স্বাগত বক্তব্য

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম-এর আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অতিমারির যেসব অভিঘাত বিভিন্ন গবেষণা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে তাতে শিশুরা বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই ক্ষতি যতটুকু স্বল্প মেয়াদে বা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিভাত হবে, তার চেয়ে বেশি হবে মধ্যমেয়াদে। অসুবিধাগ্রস্থ পরিবারের শিশুদের মধ্যে সমস্যাগুলো আরও বেশি। তিনি জানান, গবেষণার মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে অতিমারির কারণে কন্যা শিশুদের ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। ন্যুনতম ১০ থেকে ১২ শতাংশ শিশু বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে। বিশেষ করে, যাদের এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, তাদের অনেকেই ফরম পূরণ করতে পারেনি। এর পুরোটা আর্থিক কারণে নয়, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কারণও ছিল।

তিনি উল্লেখ করেন, অতিমারির কারণে অনেক শিশুর পরিবার ব্যয় সংকোচন করতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা আমিষের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে বা খাবারের পদের সংখ্যা কমিয়েছেন। এক-দুই বেলা খাবারও বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্তত ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পরিবারে শিশুখাদ্যের ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন করতে হয়েছে। এর ফলে যে পুষ্টিহীনতা হচ্ছে, তা এই প্রজন্মের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে। পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য মিড-ডে মিলের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা যাতে জরুরিভিত্তিতে চালু করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম: কিছু দুঃখজনক চিত্র

সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)-এর নির্বাহী পরিচালক এবং নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য শাহীন আনাম। তিনি উল্লেখ করেন, বাল্যবিবাহের কারণ অনেক। দারিদ্র্যের কারণে, সংসারের অনটনের কারণে এবং নানা সামাজিক কারণে বাল্যবিবাহ ঘটে।

তিনি কয়েকজনের ছবি দেখিয়ে তাদের জীবনে অতিমারিকালে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক কাহিনী তুলে ধরেন। তিনি একটি মেয়ের ছবি দেখান, যে মেয়েটি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। মেয়েদের ফুটবলের একটি টুর্নামেন্টে সে হ্যাট্রিক করে এবং তার দল গোল্ডকাপ জেতে। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সে ট্রফিও নিয়েছিল। গত বছর মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। তার ফুটবল দলের ৭ জনের বাল্যবিবাহ হয়েছে। আরেকটি মেয়ে বাল্যবিবাহের পর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের কারণে মৃত সন্তান জন্ম দেয়। সে নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং ১২ ঘন্টা পর গত ১৬ অক্টোবর সে মারা যায়। আরেকটি ছেলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তো এবং পাশাপাশি একটি ওয়েল্ডিং কারখানায়ও কাজ করতো। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন কাজে দেওয়া হয়েছিল। করোনার সময় সে কাজ হারিয়ে আরও কম বেতনে ওয়েল্ডিং কারখানায় আবার কাজ শুরু করেছে।

উপস্থাপনায় বলা হয়, বর্তমানে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের ৪ দশমিক ৩ শতাংশই শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। ১৮ বছরের নিচে ৫১ শতাংশ মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার। লকডাউনের সময় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন দেশের ২১টি জেলায় একটি দ্রুত জরিপ করে। সে জরীপে দেখা যায়, ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সের ১৩ হাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের জরিপে যে ১৩ হাজার মেয়ের বাল্যবিবাহের তথ্য উঠে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহ হয়েছে বরগুনায়। ৫০ ভাগ মেয়ের বিয়ে হয়েছে যাদের বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর। ৪৮ ভাগ মেয়ের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছর। বাকি ২ ভাগ মেয়ের বয়স ১০ থেকে ১২ বছর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাবা-মার উদ্যোগে বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়েছে। তবে অনেক জায়গায় বিয়ের রেজিস্ট্রার জেনেশুনে বিয়ে দিয়েছেন। এম.জে.এফ-এর সহযোগী কয়েকটি সংগঠন একটি ছোট আকারের জরীপ করেছে। এতে দেখা যায়, প্রায় ২৪০০ জন ছেলে কম বেতনে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আসতে বাধ্য হয়েছে। ৩ হাজারের বেশি শিশু গ্রাম থেকে শহরে কাজের জন্য চলে এসেছে। ২৫০০ জন ছেলেমেয়ে যারা আগে স্কুলে ছিল, তারা শিশুশ্রমে গেছে। লকডাউনের কারণে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল এবং পরিবারে আর্থিক অনটন দেখা দিল তখন অভিভাবকরা বাচ্চাদের কাজে নামিয়ে দেয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর সৈয়দা মুনিরা সুলতানা বলেন, পত্র-পত্রিকায় অনেক হৃদয়-বিদারক খবর পাওয়া যাচ্ছে। একটি খবরে দেখা গেছে, ৬-৭ বছরের একটি শিশু খাঁচার ভিতরে ঢুকে রং করছে, যেন সে খাঁচায় বন্দি। ২০২০ সালে চরাঞ্চলের একটি স্কুলে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ মেয়ের বাল্যবিবাহ হয়ে গেছে। সম্প্রতি হাসেম ফুড কারখানায় যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে অনেক শিশু মারা গেছে। কোভিডের কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় অনেক শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যোগ দিয়েছে।

স্কুল খোলার পরবর্তী পরিস্থিতি

শাহীন আনাম বলেন, স্কুল খোলার পর দেখা যাচ্ছে অনেক স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীতে কোনো কন্যাশিশু নেই। ইউনেস্কো ও ইউনিসেফের এক রিপোর্ট অনুযায়ী কয়েক মিলিয়ন শিশুর জীবন অতিমারির কারণে পর্যুদস্ত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, স্কুল বন্ধের কারণে অনেক মেয়ে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করে, তারা অতিমারির সময়ে ভালোভাবে কাজ করতে পারেনি। এই সুযোগে অনেক

বাবা-মা তাদের বাচ্চাদের বিয়ে দিয়েছে। সারা দেশ থেকে একই খবর আসছে, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার পর কন্যাশিশুরা পড়াশুনায় ফিরছে না—এমন বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির সাবেক পরিচালক শফিকুল ইসলাম উল্লেখ করেন, বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত দুর্বল। এই কারণে প্রাইভেট টিউশন নির্ভর একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অতিমারির সময় দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ ছিল। আবার এসময়ে অনেকের আর্থিক সক্ষমতা কমে যায়। সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ-এর প্রকল্প পরিচালক শাহীন ইসলাম বলেন, দেড় বছর পর এখন স্কুলে যেয়ে অনেক শিশুই নানা ধরণের সমস্যায় পড়তে পারে।

সরকারের প্রতিশ্রুতি কী

শাহীন আনাম উল্লেখ করেন, সরকারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে শিশুশ্রম নিরোধের। শিশুশ্রম বিলুপ্তির জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা (২০২১–২৫) রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সকল ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুদের বের করে আনা হবে। বাল্যবিবাহ বন্ধেও জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা রয়েছে। এই লক্ষ্য, ১৫ বছরের নিচে কোনো মেয়ের বিয়ে হবে না এবং তা ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে। আর সমস্ত বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হবে ২০৪১ সালের মধ্যে।

তিনি বলেন, কারখানা আইনে বলা হয়েছে, ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না। শ্রম আইনও একই কথা বলছে। বাল্যবিবাহ নিরোধে ২০১৬ সালে আইন সংশোধন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের এবং ২১ বছরের নিচে ছেলেদের বিয়ে বেআইনি এবং আইন লংঘন করলে শাস্তির বিধানও রয়েছে।

সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো এবং নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন, সামাজিক খাত সংশ্লিষ্ট ১৫টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ শিশুদের জন্য দেওয়া হবে বলে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। বাজেটে এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কি না সে বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ নান্নু মোল্লা অবহিত করেন, শ্রম আইন-২০০৬ অনুসারে ১৩ বছরের নিচে কোনো শিশুকে শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না। ১৪ থেকে ১৭ বছরের শিশুদের হালকা কাজ দেওয়া যেতে পারে বলে আইনে বলা হয়েছে। তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ দেওয়া যাবে না। যেমন—জাহাজ ভাঙ্গা, বৈদ্যুতিক কারখানা, ইটভাঙ্গা ইত্যাদি। শিশুদের কোনোক্রমেই কারখানায় কাজ করানো যাবে না। শ্রম আইনের যে বিধিমালা রয়েছে, তা আরও পরিশীলিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দুই শিশুর দুঃখজনক অভিজ্ঞতা

নীলফামারির একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী আদুরি আক্তার ১৬ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন। সংলাপে যুক্ত হয়ে তিনি তার জীবনে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। আদুরি আক্তার জানান, তার বাবা জোর করে গত বছর তাকে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পর দুই-তিন মাস তিনি বাবার বাড়িতে ছিলেন। স্বামী এলে তিনি বাড়ি থেকে অন্য দিকে চলে যেতেন। সামনে যেতেন না। এই অবস্থায় তাকে জোর করে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার স্বামী প্রায়ই তার সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করত। তাকে সংসারের সব কাজ করতে হতো এবং শ্বাশুড়ি প্রায়ই বকাঝকা করত। অত্যাচারের কারণে তিনি বাবার বাড়িতে চলে আসেন। বাবা-মাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, তিনি অত্যাচারিত এবং এই অবস্থা থেকে মুক্তি চান। কিন্তু বাবা-মা তাকে জোর করে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার তার ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। তার মনে হতে থাকে, অচিরেই তিনি মারা যাবেন এবং এই অবস্থায় আবার বাবার বাড়িতে চলে আসেন। এ পর্যায়ে তিনি বাবা-মাকে বোঝাতে সক্ষম হন এবং বাবার বাড়িতেই অবস্থান করতে থাকেন। এরপর তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এখন তিনি এমজেএফ-এর পল্লীশ্রী'র সহায়তায় আবার স্কুলে ভর্তি হয়েছেন।

কামরাঙ্গীর চরের শিশুশ্রমিক তাইজুল ইসলাম তার করুণ পরিণতির কথা জানান। শিশুটি স্কুলে পড়তো। লকডাউনের সময় স্কুল বন্ধ ছিল। লকডাউন উঠে যাওয়ায় তার বাবা তাকে একটি ঢালাইয়ের দোকানে কাজে লাগিয়ে দেয়। কারণ তাদের সংসারে অভাব ছিল। এখন স্কুল খুলেছে। তবে তাইজুল ফিরতে পারেনি। কারণ তাকে সংসারের জন্য উপার্জন করতে হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে সম্পৃক্তরা যা জানালেন

আলোচকদের অনেকেই বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম এবং স্কুলে ফেরার পরিস্থিতি নিয়ে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব নাজমা শেখ সম্প্রতি দাপ্তরিক কাজে সিলেট, খাগড়াছড়িসহ কয়েকটি জেলা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে জানিয়েছেন, ২০ থেকে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী স্কুলে ফেরত আসছে না। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় অনেক মেয়ের বাল্যবিবাহ হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের ছেলে শিক্ষার্থীদের অনেকে সংসারের প্রয়োজনে দিনমজুর, দোকানের সহায়ক কর্মচারী, কলকারখানার শ্রমিকসহ বিভিন্ন কাজে যোগ দিয়েছে। অসংখ্য বাচ্চাকে দেখা গেছে, তারা পাথর তোলার কাজ করছেন। তিনি জানান, স্কুল দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকলেও মাদ্রাসা খোলা ছিল। কিছু শিশু এই সময়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ বেলাল হোসেন জানান, স্কুল খোলার পর শিক্ষার্থীদের ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ উপস্থিত হচ্ছে বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার একটু কম। কারণ তাদের সিলেবাস শেষ হয়েছে এবং তারা নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এছাড়া জ্বর বা সর্দি-কাশি থাকলে স্কুলে আসতে বারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে এখনও পূর্ণ অবয়বে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। সপ্তাহে এক থেকে তিন দিন ক্লাস হচ্ছে, তাও পূর্ণকালীন সময়ে নয়। এসব কারণে কিছু শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকছে। বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের কারণেও কিছু শিক্ষার্থী স্কুলে অনুপস্থিত।

মোঃ বেলাল হোসেন আরও জানান, মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই তাদের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করতে পেরেছে। কত শতাংশ শিক্ষার্থী অনলাইনে শিক্ষার সাথে যুক্ত ছিল তার কোনো জরিপ অবশ্য সরকারিভাবে করা হয়নি।

নীলফামারী সদরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন নাহার জানান, বাল্যবিবাহ বন্ধে কাজ করতে কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন। বিয়ের কাজী বা ধর্মীয় নেতারা অসহযোগিতা করছেন। কনে পক্ষের বাবা-মা অসহযোগিতা করছেন। শিক্ষক সমাজও তেমন সচেতন নন। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এমন তথ্য পেলেও শিক্ষকদের অনেকেই স্থানীয় প্রশাসনকে জানাচ্ছে না। স্থানীয় চেয়ারম্যানদের জনগণের ভোট পাওয়ার চেষ্টা থাকে। ফলে বাল্যবিবাহ বন্ধের বিষয়টি অনেক সময় তারা এড়িয়ে যান।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণের উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তানজিমা পারভীন লুনা জানান, অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের সমস্ত প্রস্তুতির পর প্রশাসন তথ্য পায়। কর্মকর্তারা যেতে যেতে অনেক সময় বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন বন্ধ করে দেওয়ার পর দেখা যায় আরেক উপজেলায় আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে অভিভাবকরা সেই মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও অনেক সময় বিয়ে বন্ধ না করার অনুরোধ করেন এই যুক্তি দিয়ে যে, বিয়ের সমস্ত আয়োজনের জন্য অনেক ঋণ করতে হয়েছে। শেষ মুহূর্তে বিয়ে বন্ধ করলে অভিভাবক সংকটে পড়ে যাবেন। তিনি মনে করেন, শিশুশ্রম হচ্ছে সবাই জানে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে না।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শাখার যুগ্ম মহাপরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তারা কলকারখানা পরিদর্শন করতে যেয়ে দেখেছেন, শিশুশ্রম আগের চেয়ে বেড়েছে। বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম বেড়ে যাওয়ার পেছনে দারিদ্র্যের পাশাপাশি সামাজিক কারণও রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

কুমারখালি কুষ্টিয়ার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ফেরদৌসি নাজনীন জানান, তার কর্ম এলাকায় করোনার সময় বাল্যবিবাহ অনেক বেড়ে যায়। এখন কমেছে, কারণ স্কুল খুলেছে। সবাই নতুন করে পড়াশোনা শুরু করেছে।

প্রস্তুতি কতটুকু

মোঃ বেলাল হোসেন জানান, কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে ২০২০ সালের ১৮ মার্চ থেকে স্কুলের শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২৯ মার্চ থেকে টেলিভিশনের মাধ্যমে বিকল্প পন্থায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনলাইন কার্যক্রমে শিক্ষাদানের জন্য অর্ধেক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রথম দিকে দুর্বলতা থাকলেও পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইন শিক্ষাদানে অভ্যস্ত হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাফলের মধ্যে কোনো ঘাটতি আছে কী না তা যাচাই করতে এরপর অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়।

নাজমা শেখ জানান, মন্ত্রণালয়ের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা বাচ্চাদের স্কুলে ফেরানোর চেষ্টা করছেন। মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বাচ্চাদের স্কুলে আনার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি বাড়ি বাড়ি যেয়ে বাচ্চাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। থানা পর্যায়ের কর্মকর্তারা এই কার্যক্রম মনিটরিং করছেন। শিক্ষার্থীদের একটি অংশ উপবৃত্তি নেওয়ার সময় স্কুলে এলেও অন্য সময়ে তারা স্কুলে আসে না, এমন প্রবণতাও দেখা গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তানজিমা পারভীন লুনা অবহিত করেন, উঠান বৈঠক, কমিটি সভাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি রয়েছে। একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ চলমান রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা মিলে যৌথভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম রয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শুধু প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না। সরকারের জনবল ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকারের সাথে বেসরকারি পর্যায়ের সংগঠনগুলো মিলে একটি সামাজিক জাগরণ তৈরি করতে হবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, কর্মক্ষেত্রে কোনো শিশুশ্রম পাওয়া গেলে এবং কোনো শ্রমিকের অধিকার ক্ষুন্ন হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের হটলাইনে (১৬৩৫৭) যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। শিশুশ্রম নিরসনে অধিদপ্তর অনেক কাজ করে। অধিদপ্তরের একটি কর্ম-পরিকল্পনা (২০২১-২৫) রয়েছে, যার লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরণের শিশুশ্রম নিরসন করা।

চট্টগ্রামের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিদর্শক আবদুল্লাহ আল সাকিব মুবাররাত বলেন, শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শিশুশ্রম থাকলে এই বছর থেকে সেসব কারখানার লাইসেন্স নবায়ন করা হবে না। জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রত্যেক কারখানা মালিককে এই বিষয়ে চিঠি দেওয়া হবে। শিশুশ্রম পাওয়া গেছে এমন কিছু কারখানার লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে। কারখানা শিশুশ্রম মুক্ত করবেন এমন অঙ্গীকার নিয়ে লাইসেন্স নবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে প্রত্যেক জেলায় ও বিভাগে কারখানার লাইসেন্স স্থগিত করা গেলে শিশুশ্রম মুক্ত করা যাবে। এনজিওরা কাজ করছেন তাদের কাছ থেকে তালিকা নিয়ে। তারা এসব বাচ্চাদের স্কুলে ফেরানোর কাজ করছেন।

উদ্যোগ-এর নির্বাহী পরিচালক উম্মে নেহার জানান, এমজেএফ-এর পার্টনার হিসেবে তাদের সংস্থা বাল্যবিবাহ বন্ধের উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত। সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করতে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম তাদের রয়েছে। বাল্যবিবাহের খবর পেলে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহায়তা নিয়ে তা বন্ধ করা হয়েছে।

শিশুশ্রমের বৈশ্বিক চিত্র

সৈয়দা মুনিরা সুলতানা শিশুশ্রমের বৈশ্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, গত জুন মাসে আইএলও-ইউনিসেফ এর একটি যৌথ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে, গত দু'দশকে প্রথমবারের মতো সারা বিশ্বের শিশুশ্রম বেড়েছে। ১৫২ মিলিয়ন থেকে এ সংখ্যা ১৬০ মিলিয়নে দাড়িয়েছে। প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশুশ্রমে নিয়োজিত। এই বিশাল সংখ্যার পেছনে একেকটি বাচ্চার শৈশব জড়িত। শুধু তাদের শৈশব নষ্ট হচ্ছে কিংবা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা নয়, তারা ভবিষ্যতে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে। ফলে তারা নিম্ন-আয়ের কাজ করবে এবং দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের মধ্যে পড়ে যাবে। এর একটা দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

আইএলও-ইউনিসেফ এর রিপোর্টে আরেকটি ভয়াবহ আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে। কোভিড অতিমারির ফলে ২০২২ সালের মধ্যে প্রায় ৯ মিলিয়ন শিশু শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে। এই সমস্ত শিশু যারা অতিমারির অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ তাদের শিশুশ্রমে নিয়োজিত হওয়ার সংখ্যা বেড়ে ৪৬ মিলিয়ন হতে পারে, যদি না ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তাদের নিয়ে আসা যায়।

চাই সামাজিক আন্দোলন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, যে সমস্ত বাল্যবিবাহ হয়েছে সেক্ষেত্রে যদি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সনদ না দেওয়া হতো, প্রশাসনের দিক থেকে কোনো শৈথিল্য না থাকতো এবং জন্ম নিবন্ধনের ভালো ব্যবস্থা থাকতো তাহলে এটি মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল। এখন এটি একটি সামাজিক আন্দোলনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, স্কুলকে সহায়তা দেওয়া, শিক্ষকদের সহায়তা দেওয়া, শিশুদের পুষ্টিহীনতা লাঘবে নজর দেওয়া এবং সর্বোপরি কন্যাশিশুদের ঝরে পড়া রোধ করা—একটি সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের সাথে যৌথভাবে এসব মোকাবেলা করতে না পারলে সামাজিকভাবে ও জাতীয়ভাবে এই প্রজন্মের কাছে দায়ী থাকতে হবে।

সৈয়দা মুনিরা সুলতানা মনে করেন, অনেক সময় চাপের মধ্যে থাকলে উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেমন—তৈরি পোশাক শিল্পে শিশুশ্রম নিরসন হয়েছে নানান ধরণের চাপের কারণে। লক্ষাধিক শিশুকে মুক্ত করা গেছে। আইএলও'র পক্ষ থেকে তিনি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেন। এগুলো হলো—সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো, ব্যাপক সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, দারিদ্র্যের কারণে যারা বাচ্চাদের শিশুশ্রমে বা বাল্যবিবাহ দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে পড়েন, তাদের কর্ম-সংস্থান নিশ্চিত করা, শিশু সুরক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো এবং অতিমারির ফলে ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলে ফেরত আনতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। তিনি মনে করেন, এখনও সমাজে সচেতন মানুষ আছে। তাদেরকে সাথে নিয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে আশা করেন তিনি।

শফিকুল ইসলাম বলেন, যারা ঝরে পড়েছে তাদের ফেরত আনতে সবক্ষেত্রে একক কোনো নীতি নিলে হবে না। শুধু প্রণোদনা দিলে হবে না, একটা সামাজিক আন্দোলনও দরকার। মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি হয়তো একটি আছে। কিন্তু জবাবদিহিতার জায়গায় সরকারকে শক্তভাবে চাপ দিতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ যদি দায়বদ্ধতার অংশ হয় তাহলে অনেক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ফেরত আনা সম্ভব হবে। বাংলাদেশকে এই বিষয়ে একটি জোরালো উদ্যোগ নিতেই হবে এবং সংবিধানে যে অঙ্গীকার রয়েছে, সেই জায়গা থেকে এটি ভাবতে হবে।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট-এর প্রধান সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, সামাজিক আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে। এর সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও দরকার। যারা ভালো কাজ করছেন, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রণোদিত করা দরকার। তাদেরকে মূল্যায়ন করা দরকার।

পরিকল্পনা আছে, সমস্যা বাস্তবায়নে

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক এবং নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য রাশেদা কে চৌধুরী শিক্ষা খাতে 'কোভিড রেস্পন্স এন্ড রিকভারি প্ল্যান' বা সরকারের কোভিড প্রস্তুতি ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার মধ্যে ১৯ দফা নির্দেশনা রয়েছে যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন করার কথা। অনেক বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে, তবে সমস্যা বাস্তবায়নে। তিনি মনে করেন, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশীজন হলো শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক। তৃতীয় অংশীজন হলো শিক্ষক। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদেরকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। তার মতে, বাল্যবিবাহ নিরসনে বিভিন্ন আলোচনায় কাজীদের রাখতে হবে। অংশীজনদের যদি ভালভাবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিশু সহায়ক আইন ও নীতি আছে। কিন্তু মনিটরিং এর জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে। হাসেম ফুডস-এর দুর্ঘটনার পর দেখা গেছে, ১৪-১৫ বছরের কিছু ছেলে স্কুল বন্ধ থাকায় সেখানে কাজ করতে এসেছিল। কারখানা মনিটরিং এ দুর্বলতা ছিল।

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, করোনার সময় বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে শিশুদের জন্য কতটুকু ছিল এবং কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে তারও একটা বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে, বাবা-মার কাছে সাহায্য পৌঁছালে শিশুরা তার উপকারভোগী হয়। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। শিশুদের জন্য লক্ষ্যনির্দিষ্ট কর্মসূচি দরকার। তার মতে, শিশুশ্রম নিরসনে বাইরের চাপের চেয়ে নিজেদের মন থেকে কাজ করতে হবে। আর্ন্তজাতিক চাপও এখন বাড়ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর জিএসপি এখনকার শর্তগুলোতে শিশুশ্রম নিরসনে জোর দিচ্ছে। সুতরাং বাইরের চাপ থাকবে ও বাড়বে।

বিয়ে হলেও উপবৃত্তি দেওয়া হোক

রাশেদা কে চৌধুরী উল্লেখ করেন, যে সমস্ত মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী তারা উপবৃত্তি পাবে না। কেননা এটি শর্তযুক্ত নগদ হস্তান্তর। গণস্বাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করা হচ্ছে যাতে বাল্যবিবাহ হয়ে গেলেও মেয়েরা উপবৃত্তি পায়। সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সম্ভবত সরকার সব তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তিনি জোরালো দাবি করেন, যেসব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তারা যাতে বৃত্তি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শাহীন আনাম এই দাবিকে সমর্থন করেন এবং এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি সুপারিশ করেন। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, আগামী দিনে কন্যাশিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য উপবৃত্তির বাইরে বিশেষ প্রণোদনার বিষয়টি বড় করে ভাবতে হবে।

তথ্যের ঘাটতি পূরণ করতে হবে

রাশেদা কে চৌধুরী মনে করেন, তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। কিছু তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে আসছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। তিনি অবহিত করেন, স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের নিয়ে গবেষণার জন্য সম্প্রতি বিবিএস ও ইউনিসেফ একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। তারা ১০ হাজার খানার ওপর জরিপ করবে। এডুকেশন ওয়াচ থেকে গণস্বাক্ষরতা অভিযানও তৃতীয় পক্ষ হিসেবে স্বাধীনভাবে ডাটা সংগ্রহ করবে। তিনি জানান, একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ভর্তির জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়কার তথ্য মনে হয় সরকারের কাছে রয়েছে। কতজন ভর্তি হয়েছে সেই তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। শিক্ষার্থীরা যারা ঝরে পড়েছে, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে—সেই তথ্য কেন পাওয়া যাচ্ছে না? তিনি এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ফলে তথ্যের ঘাটতি দূর করা খুবই প্রয়োজন। শাহীন আনাম বলেন, যারা গবেষণা করছেন, তা অব্যাহত রাখা উচিত এবং মাঠ থেকে আরও তথ্য তুলে আনা উচিত।

শিশুশ্রমের কারণে অদক্ষ শ্রমিক তৈরি হওয়া এবং শ্রমবাজারে দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব সম্পর্কে আইএলও প্রতিনিধির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, এর একটি ইকোনমিক ল্যান্ডস্কেপিং করতে হবে। আইএলও সহায়তা করতে পারে। সিপিডি ও নাগিরক প্ল্যাটফর্ম এই বিষয়ে কাজ করতে পারে। শিশুদের সুরক্ষা দিতে না পারলে বাংলাদেশ কীভাবে পিছিয়ে যাবে তা তুলে ধরতে হবে। শিশুদের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কী কী করণীয় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে।

সুপারিশ

স্কুল থেকে ঝরে পড়াদের ফিরিয়ে আনতে এবং নতুন করে ঝরে পড়া রোধে আলোচকরা বিভিন্ন সুপারিশ করেন। শাহীন আনাম মনে করেন, নিম্ন আয়ের পরিবারের ছেলে মেয়েদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা আরও বাড়াতে হবে যাতে তাদের আবার স্কুলে পাঠানো যায়। বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে বড় ধরণের ক্যাম্পেইন দরকার। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎপর হতে হবে। হেল্পলাইনগুলো আরও সক্রিয় করতে হবে। সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিভিন্ন ধরণের অংশীজনের সচেতনতা বাড়াতে হবে, যাতে এই ক্ষতিকারক চর্চা আর না হয় এবং বিশেষ করে কোনো সংকটের সময় এসবের বাড়তি প্রবণতা দেখা দিলে তা বন্ধ করতে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম রোধ করা যাদের দায়িত্ব, তাদের অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। আইন, নীতি ও কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদেরকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। যারা এই দায়িত্বে আছে, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। কীভাবে শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকার, বেসরকারি সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো মিলে একটি জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা করলে সুফল আসতে পারে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, যে সমস্ত স্কুল থেকে বাচ্চারা ঝরে পড়ছে বা বাল্যবিবাহ হচ্ছে, সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের এবং পরিচালনা পর্ষদকে একটা জবাবদিহির মধ্যে আনা উচিত। শিক্ষা মন্ত্রলালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে একটি সার্কুলার জারি করা উচিত। একটি রিপোর্টিং মেকানিজমের আওতায় মনিটরিং করতে হবে, যা মাসভিত্তিক, ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক হতে পারে। তাহলে সামাজিকভাবে যারা স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত আছেন, তারা উদ্যোগী হবেন এবং এ বিষয়ে আরও দায়িত্ববান হবেন। এটি একটি জবাবদিহিতার কাঠামো হতে পারে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে, ঝরে পড়া নিরসন করতে হবে। যারা বিভিন্ন কারণে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, তাদের ফেরত আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদের পড়াশোনার ঘাটতি পূরণ করতে হবে। তৃতীয়ত, দেড়-দুই বছর বন্ধ থাকার পর স্কুলের অবকাঠামোগত পরিস্থিতি এখন দূর্বল। আগামী দিনে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে এমপিওভুক্ত নয় এমন স্কুলের আর্থিক সামর্থ্য নেই। সরকারের পক্ষ থেকে কীভাবে তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং কীভাবে এই সহায়তা ব্যবহার করা হবে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কিন্ত সব স্কুল তা পায়নি। স্কুল রক্ষা করতে হলে শিক্ষকদের রক্ষা করতে হবে। এমপিওভুক্ত নন এমন শিক্ষকরা খুবই দুর্বিষহ জীবনের মধ্যে আছেন। তাদের বেতন, উৎসব বোনাস অনেক কিছুই বকেয়া রয়ে গেছে। এগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে, তা বড় বিষয়।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বেসরকারি সংগঠনগুলো এই সময়ে কী করেছে বা কী করতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। বেশিরভাগ এনজিও প্রকল্পভিত্তিক কাজ করে। প্রকল্প শেষ তো কাজ শেষ। এই জায়গা থেকে বের হতে হবে। দরকার হলে যারা অর্থায়ন করে তাদের সাথে দেনদরবার করতে হবে। তিনি মনে করেন, বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারের পক্ষে ঘরে ঘরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে কমিউনিটির ভূমিকা থাকতে হবে। বেসরকারি সংস্থাগুলো তো কমিউনিটির সাথে কাজ করছে। তিনি জানান, সরকারি বিজ্ঞপ্তির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ছাড়া কোনো সংগঠন ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারে না। সংগঠনগুলো শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিবারে কাজ করতে পারে। অভিভাবকদের সাথে কাজ করতে পারে। এসব কাজে কমিউনিটি রেডিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীতা তুলে ধরেন তিনি।

শফিকুল ইসলাম বলেন, দেড় বছর বন্ধ থাকার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নেওয়ার একটা উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্যোগ হতে হবে স্থানীয় বৈশিষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেন্দ্র থেকে কিছু দিক-নির্দেশনা যেতে পারে। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় বিদ্যালয়কেন্দ্রিক উদ্যোগ আসতে হবে। খুব বেশি সামষ্টিকভাবে চিন্তা করলে হবে না। এটি অনেক বেশি ব্যষ্টিক পর্যায়ের। কারণ নানা জায়গায় নানা অবস্থা আছে। একটি মানসম্মত বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করা যাবে সেই জায়গায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা সম্ভব।

তানজিমা পারভীন লুনা মনে করেন, সম্মিলিতভাবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা নিজের দায়িত্ব মনে করতে হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এককভাবে সম্ভব নয়। মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষকদের প্রতি কঠোর নির্দেশনা আসা দরকার যাতে বাল্যবিবাহ বন্ধে তাদের উদ্যোগ সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা থাকবে। এই ধরণের পদক্ষেপ নিলে উপকার হতে পারে। যারা জোর করে বাল্যবিবাহ দিচ্ছেন তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। প্রশাসন অনেক সময় প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত পায় না। স্থানীয় জনগণ যদি আগাম তথ্য দেয়, তাহলে বন্ধ করার জন্য তা খুবই সহায়ক হবে। অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বপন কুমার দত্ত, ঝরে পড়া রোধে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শক্তিশালী কমিটি করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখার সুপারিশ করেন। একেকজন শিক্ষককে একেকটি গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

কাজী ফারুক বলেন, গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। পুরোনা দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সিলেবাস বদলালেই সব ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে যাবে, এমনটি নয়। লেখাপড়া মানেই শুধু বই পুস্তক পড়া নয়। এর মধ্যে খেলাধুলাও যোগ হতে পারে। প্রযুক্তির নতুন উপকরণের মূল্যায়নও সেভাবে করা হচ্ছে না। তিনি সুপারিশ করেন, প্রতিবন্ধী শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। সংকট নিরসনে সৃজনশীল উদ্ভাবনের দিকে যেতে হবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বাচ্চাদের পুষ্টির জন্য স্কুলে খাবার দেওয়া, বিনামূল্যে যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা ও শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোসহ বিভিন্ন প্রস্তাব দেন। শাহীন ইসলাম বলেন, বিবাহ রেজিষ্টার এবং মসজিদের ইমামসহ স্থানীয় পর্যায়ে যারা ধর্মীয় নেতা আছেন, তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে এবং সচেতন করতে হবে। অনেক হেল্পলাইন আছে। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় এ সম্পর্কে অনেকে জানেন না। বাড়ি বাড়ি হেল্পলাইনের নম্বর সংবলিত ষ্টিকার লাগানো যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি ষ্ট্যান্ডিং কমিটি থাকে, যার মধ্যে একটি হলো শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত। এই কমিটিকে সক্রিয় করতে হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পাড়া পর্যায়ে যুবকদের নিয়ে একটা কমিটি করা যেতে পারে।

সমাপনী বক্তব্য

সমাপনী বক্তব্যে শাহীন আনাম বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা দিতে হবে। তিনি মনে করেন, সরকারের সময়াবদ্ধ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নেই বেসরকারি সংস্থাগুলো কাজ করছে যাতে সরকার তার অঙ্গীকার পূরণ করতে পারে। এসব সংস্থা প্রতিপক্ষ নয়। সংবিধান থেকে শুরু করে অনেক আইন ও নীতি বলছে, শিশু সুরক্ষা আমাদের, রাষ্ট্রের ও সমাজের বড় দায়িত্ব। তিনি ঝরে পড়া শিশুদের কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সেজন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের আহবান জানান।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সূচনা বক্তব্য ও মূল উপস্থাপনা

মিজ শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

স্বাগত মন্তব্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

বিশেষ মন্তব্য

মিজ রাশেদা কে চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান; এবং
কোর গ্রুপ সদস্য
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সঞ্চালক

জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

আলোচকবৃন্দ

মিজ নাজমা শেখ
উপ-সচিব (বিদ্যালয়)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব মোঃ বেলাল হোসাইন
পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক উইং, মাধ্যমিক ও উচ্চ
মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. শফিকুল ইসলাম
সাবেক পরিচালক
শিক্ষা কর্মসূচি, ব্র্যাক

ড. মোহাম্মদ নাসুম মোল্লা
যুগ্ম সচিব, শ্রম অধিশাখা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মিজ সৈয়দা মুনিরা সুলতানা
ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

ডা: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্ম মহাপরিদর্শক
স্বাস্থ্য শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান
পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব আবদুল্লাহ আল সাকিব মুবাররাত
উপ-মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব শাহীন ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ

বিশেষ বক্তা (স্থানীয় পর্যায় থেকে)

মিজ জেসমিন নাহার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নীলফামারী

মিজ ফেরদৌস নাজনিন
উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার
কুমারখালী, কুষ্টিয়া

জনাব স্বপন কুমার দত্ত
উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ

মিজ তানজুমা পারভীন লুনা
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
কুমিল্লা সদর দক্ষিন, কুমিল্লা

মিজ রওশন আরা বেগম
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
বরিশাল

মিজ উম্মে নেহার
নির্বাহী পরিচালক
উদ্যোগ

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: জাকির হোসেন এবং অন্বেষা জাফরিন
সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

আয়োজক

Manusher Jonno Foundation

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

www.bdplatform4sdgs.net
BDPlatform4SDGs
BDPlatform4SDGs

ডিসেম্বর ২০২১

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net